দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ... 14 NOV 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1 ...

চতুরঙ্গ

সুহৃদ

একজন দুঃখী ছেলের কথা না বলে পারছি না। পনেরোর কাছাকাছি তার বয়স। ছোটখাট গড়ন। অপুষ্ট শরীর। ঢাকার দ্বিতীয় সারির একটি কলেজ থেকে এবার এইচ, এস, সি পরীক্ষা দিয়েছিল, উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

নিতান্তই ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে আমার দেখা ও আলাপ। সে জানে না আমি পেশায় একজন সাংবাদিক এবং বেশ কিছুকাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আমার আছে। তার ফেল হওয়ার কারণ হিসাবে প্রথমে সে দায়ী করল পাসের হারের ক্ষেত্রে গৃহীত কড়াকড়ি ব্যবস্থাকে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে দুনিয়ার বেশীরভাগ দেশেই যে পাসের হার নব্বই-পঁচানব্বই পার্সেন্টের কম যায় না, দেখলাম এই তথ্য তার জানা আছে। খুব বলল সে এই পয়েন্টের উপর। বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গিতে মন্তব্য করল যে, এই যদি হয় বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গি, তাহলে দেশের উন্নতি হবে কি করে! সে ঠিক গুছিয়ে কথাগুলি বলতে পারছিল না। তবে তার দুঃখের ধার ও চোখের অশ্রু সজলতা থেকে বিষয়টি অনুধাবন করা যাচ্ছিল। বোর্ডকে দোষ-টোষ দিয়ে পরে অবশ্য বলল যে, অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ কি, দোষ তার নিজেরই। দোষ তার ও তার কপালের।

তার ঘর-বাড়ির খবরাখবর নিলাম। জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জের দিকে বাড়ি। বাবা একজন গৃহস্থ, দুই বিঘা জমি আছে এবং দুটো হাল। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে সে-ই বড়। দ্বিতীয় বিভাগে এস, এস, সি পাস করেছিল বলে আরো ভালো রেজাল্টের আশায় ঢাকা এসে ভর্তি হয়েছিল। হোস্টেলের খরচ চালাতে কষ্ট হচ্ছিল তার বাবার। তবু ছেলের ভবিষ্যতের আশায় সেই কষ্ট তিনি হাসিমুখে করে যাচ্ছিলেন। ছেলের ফেল হওয়ার খবরে বেশী দুঃখ পাবেন তিনি। মা সবসময় নামাজ পড়ে ছেলের পাসের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া ভিক্ষা করতেন, দুঃখ পাবেন তিনিও। বলতে বলতে ছেলেটি হাতের চেটো দিয়ে চোখের পানি মুছল। পাসের খবর নিয়ে বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার। হাতের টাকা-পয়সা ফুরিয়ে আসছে, এদিকে সে বাড়ীও যেতে পারছে না। কোন্ মুখে সে বাড়ী যাবে?

ছেলেটির সাথে আমার দেখা গত ১০ই নভেম্বর তারিখে, মহিলা সমিতির সামনের রাস্তায়। সেদিন সারা বাংলাদেশ জুড়ে হরতাল। হরতালের অন্যান্য দিনে কম-সংখ্যায় হলেও রিকশার দেখা পাওয়া যায় রাস্তায়। সেদিন বাসা থেকে প্রেস ক্লাবে যাওয়ার পথে একটিও রিকশা চোখে পড়েনি। হেঁটে পথ অতিক্রম করছি, এই সময় ছেলেটি আমার সঙ্গ ধরল। আমরা পাশাপাশি পথ হাঁটছিলাম। ছেলেটিকে খুবই বিষণ্ন ও উদ্দেশ্যহীন মনে হচ্ছিল। হাতে তার একটি খবরের কাগজ। ক্রমে ক্রমে তার খবর জানা গেল। এবারের এইচ, এস, সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে শতকরা ৬৮ জন ফেল হওয়া ছাত্রের সে একজন। ১০ই নভেম্বরে সবচে দুঃখিতদেরও একজন সে। কাকরাইল মসজিদের কাছে এসে সে সালাম জানিয়ে চলে গেল অন্যদিকে। আমি ভাবছিলাম, পরীক্ষায় ফেল হওয়ার জন্যে ছেলেটি প্রথমে বোর্ডের কড়াকড়িকে এবং পরে নিজেকে ও নিজের কপালকে দায়ী করেছে। আসলে দায়ভাগ কার বা কিসের উপর বর্তায়?

শুধু দেওয়ানগঞ্জের এই ছেলেটি তো নয়। বাংলাদেশের সব ক'টি বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ফেল হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর বেলায়ই এই প্রশ্নটি ওঠে। কে বা কারা দায়ী? কোন্ ব্যক্তি বা পরিস্থিতি এই জন্যে দায়ী? দুনিয়ার বেশীরভাগ দেশে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পাসের হার নব্বই-পঁচানব্বই পার্সেন্টের কম হয় না, শুধু আমাদের দেশেই কেন পাসের বেলায় এত ভয়াবহ রকম কম হার?

পরীক্ষায় পাস বা ফেলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীর দায়ভাগ অবশ্যই আছে। হয় মেরিটের দিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে সে ন্যূন, নতুবা পড়াশোনায় সে উপেক্ষা ও অবহেলা দেখিয়েছে। এই রকম একটি কথা পরীক্ষায় ফেল হওয়ার কারণ হিসেবে অবশ্যই বলা চলে। ঠিক একইভাবে পরীক্ষায় পাস দেওয়ার জন্য একজন শিক্ষার্থীকে তার মনোযোগ ও মেরিটের জন্য জানানো যায় অভিনন্দন। ফেলের বিষয়টি আলোচনা করা যাক। ফেলের জন্য প্রাথমিকভাবে এবং প্রধানতঃ শিক্ষার্থীই দায়ী বটে। সে ছাড়া আর কে? কিন্তু দায়ী কি শুধু এই বেচারা? শিক্ষার্থীর ফেল হওয়ার দায়ভাগ কি বর্তায় না শিক্ষকের উপর, অভিভাবকের উপর, বোর্ড এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপর?

অভিভাবকের কথা বলা যাক। শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্র গঠনে তাঁরই বোধকরি সবচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিক্ষার্থীর উপর তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়বেই। তিনি অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ ও ফাঁকিবাজ হবেন এবং আশা করবেন যে, ছেলে বা মেয়ে সময়ে মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠবে, —এটা বাস্তবে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ছেলে-মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপারে তাকে অবশ্যই যথোচিত দৃষ্টি রাখতে হবে। ছেলে-মেয়েদের জন্য তাকে শ্রম, মনোযোগ ও সময় দিতে হবে। যারা গ্রামের অভিভাবক, তারা হয়তো তাদের ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষিত অভিভাবকের মত পড়াশোনার ক্ষেত্রে গাইডেন্স দিতে পারেন না। তবে পড়াশুনার জন্য তাদের খরচ যোগানো, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য তাদের কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার ইত্যাদি বিষয়ের ইতিবাচক একটা প্রভাব রয়েছে এবং সেই প্রভাবই অনেক সময় শিক্ষার্থীদের জন্য প্রেরণা ও গাইডের কাজ করে। মোটকথা, অভিভাবকের উপর শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন, পরীক্ষায় তাদের পাস-ফেল কিংবা পরীক্ষায় তাদের ভাল করা বা খারাপ করার বিষয়টি যথেষ্ট নির্ভর করে।

শিক্ষার্থীর জীবনে শিক্ষক (শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী উভয় অর্থে) হচ্ছেন অন্যতম চালিকা শক্তি ও প্রেরণাদাতা। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে, এমনকি ষাটের দশকে সমাজে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শিক্ষকের দেখা পাওয়া যেত। অনেক বড় ঘরের ছেলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালোভাবে পাস দেওয়ার পর আদর্শ হিসাবে বেছে নিতেন শিক্ষকতার কাজ। পঞ্চাশের দশকে আনন্দ মোহন কলেজে পড়ার সময় একজন অধ্যাপককে পেয়েছিলাম। নাম মোক্ষদাচরণ চক্রবর্তী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে স্বর্ণপদক পেয়ে পাস করেছিলেন জমিদারের ছেলে, অধ্যাপনা করেই জীবন কাটিয়ে দেন। সে সময় তার মতো আরো বহু শিক্ষক দেখেছি, একেবারে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ। শৈলেশ্বর স্যান্যাল ছিলেন ১৯৫০ সালের দিকে ময়মনসিংহ মৃত্যুঞ্জয় স্কুলের শিক্ষক। লম্বা ছিপছিপে সুদর্শন দেখতে। এয়ারফোর্সে কমিশণ্ড হয়েছিলেন। চাকরি করেননি, ছুটে এসেছিলেন নিজ জেলা শহরে শিক্ষকতা ব্রতে জীবন উৎসর্গ করে দিতে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় স্কুলেই ছিলেন। ভারতে মাইগ্রেট করার কথা শুনতে পারতেন না। বলতেন, খারাপ হোক ভালো হোক, এই তো আমার দেশ, এই দেশ ছেড়ে কোথায় যাব? কেন যাব? ১৯৭১ সালে হানাদার পাক বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের হাতে এই মহান শিক্ষকের নিধন ঘটে। জীবন ঘষে সমাজের জন্য আলো জালিয়ে এভাবেই নরপিশাচদের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

চল্লিশ, পঞ্চাশ এমনকি ষাট দশকেও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ বহু শিক্ষকের দেখা পাওয়া যেত। তাঁরা নিজেরা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, ছেলেমেয়েদের চেষ্টা করতেন শেখাতে। শুধু বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া নয়, ছেলে-মেয়েদের চরিত্র গঠনেও সাহায্য করতেন। এখন এই জাতটা প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। খুঁজলে এখনো পাওয়া যায় সেই জাতের শিক্ষক। তবে তারা সংখ্যায় খুবই বিরল হয়ে পড়েছেন। বেশীর ভাগ যাঁদের পাওয়া যায় তারা অন্য কোথাও সুবিধা করতে না পেরে স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছেন। ভালো স্কুল, ভালো কলেজের কথা আলাদা। সেখানে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ভালো শিক্ষক নেওয়ার ব্যবস্থা হয়ে থাকে বলে সেখানকার শিক্ষক ও শিক্ষকতার মান মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তবে দেশে ভালো স্কুল ও ভালো কলেজের সংখ্যা কটাইবা? বেশীরভাগই সাধারণ মানের।

শিক্ষকদের বেশীরভাগই উপযুক্ত বেতন পান না। তাঁদের নিজেদের শিক্ষা ও ওরিয়েন্টাশনও শিক্ষকোচিত নয়। নিজেরা না জানলে অন্যদের তাঁরা শেখাবেন কি করে? তারা নিজেদের উৎসর্গ করেন বটে। তবে শিক্ষকতার আদর্শে নয়, জীবন ধারণের রূঢ় বাস্তবতা ও গ্লানির কাছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আমাদের দেশে এতই ন্যূন ও নিম্নমানের যে, প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রশিক্ষণ না পাওয়া শিক্ষকের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না। স্কুল শিক্ষকদের একটা বড় অংশের জন্য যেনতেন প্রকারে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও কলেজ শিক্ষকের জন্য সেটুকুও নেই। ফলে ক্লাস-লেকচার বা মুখের বুলিটুকুই হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষার সবচে বড় উপাদান। দুনিয়ার কোন দেশেই বোধহয় এমন অকিঞ্চিৎকর শিক্ষার মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যুক্ত করে রাখার দৃষ্টান্ত নেই।

একজন শিক্ষার্থীর ফেল হওয়ার পেছনে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষভাবে যেমন দায়ী, তেমনি কিছুটা দায়ভাগ অভিভাবক ও শিক্ষকের উপরও বর্তায়। তবে এইসব বিপর্যয়ের পেছনে সবচে বড় ভিলেন বোধহয় শিক্ষা-ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থার কারণেই বোধ হয় এই দেশের ছেলেমেয়েরা পাস করে ও না-করে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অশিক্ষিত থেকে যায়। ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে কোন প্রশিক্ষণই তার হয় না স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে সাধারণভাবে শেখে কতগুলি অর্থহীন শব্দ, ধারণা এবং থিয়োরী। এইসব শব্দ, ধারণা ও থিয়োরী জীবনে চলার ক্ষেত্রে তেমন কোন কাজেই আসে না।

শিক্ষা ব্যবস্থার সবচে ত্রুটিপূর্ণ হচ্ছে সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতি। বাংলাদেশ হওয়ার পর উনিশ বছর কেটে গেছে। আজ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী চেতনা, ঐতিহ্য ও শাশ্বত শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সিলেবাসের সংস্কার করা হয়ে উঠেনি। শিক্ষা বোর্ড যদি এই কাজটি সত্যিকার দেশাত্মবোধ ও মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করতেন, তাহলে জেনারেশন তৈরীর ক্ষেত্রে দেশ এগিয়ে যেতে পারত। দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞানসম্মত দেশাত্মবোধের চেতনায় সমুন্নত এবং শাশ্বত মূল্যবোধে উজ্জীবিত সিলেবাস তৈরীর ক্ষেত্রে তেমন উদ্যোগই আজ পর্যন্ত গৃহীত হতে দেখা গেল না।

পরীক্ষা পদ্ধতির এদিক-ওদিক খুচরো সংস্কার হয়েছে। তবে কাঠামো এখনো অপরিবর্তিত। সেই মুখস্থ বিদ্যা খাতায় উগড়ে দেওয়ার নামই পরীক্ষা। এই পরীক্ষা পদ্ধতি দুনিয়ার কোন স্বাধীন দেশে আছে কিনা সন্দেহ, কিন্তু আমাদের দেশে আছে একেবারে বহাল তবিয়তে। ডিগ্রি-সর্বস্ব শিক্ষার গোড়াই হচ্ছে এই পরীক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনায় যাঁরা ন্যস্ত, তাদের কর্তৃপক্ষ মহল বক্তৃতা দেওয়ার সময় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তোলেন। এত ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি না করে দেশের স্বার্থে শিক্ষার স্বার্থে নতুন সিলেবাস তৈরী, পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে যদি তারা এগিয়ে আসতেন, দেশ ও সমাজ উপকৃত হতে পারত? সবকিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি চলে, কিন্তু শিক্ষা নিয়ে নয়। এটুকু স্মরণ রাখা সকলের জন্য দরকার বলে আমরা মনে করি।